THE IMPRESSION, A Journal on Multidisciplinary Studies, A Peer Reviewed Journal
Annual Issue (2019) (ISSN: 2278-2699)

# দেবেশ রায়ের উপন্যাসে কৃষকজীবন বৃত্তান্ত

**রিপন রায়***

***সারসংক্ষেপ:*** *"দেবেশ রায়ের কথাসাহিত্য হল সমাজ বাস্তবতার দলিল। তাঁর উপন্যাস-আখ্যানবিশ্ব মহাকাল ব্যাপ্তিকে ছাপিয়ে যায়। একজন মননঋদ্ধ কথাসাহিত্যিক তিনি। গোটা ভারতবর্ষের সামাজিক-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক পালাবদলের ইতিহাস ব্যাপৃত করেছেন। উপন্যাস 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' হল বলিষ্ঠ উপন্যাস। ভারতীয় কৃষকদের দুরবস্থার চিত্র বিধৃত হয়েছে দুই আখ্যান পরিসরে। চ্যারকেটু, টুলটুলি খেতখেতু কিংবা বাঘারু প্রত্যেক চরিত্র অনন্ত ক্ষুধায় জর্জরিত কৃষক চরিত্র। ভারতীয় কৃষক দুরবস্থার দোসর এরা। দেবেশ রায় তাঁর বৃহত্তর অভিজ্ঞানে কৃষক জীবনের করুণ দৈন্য দশাকে মহাকাব্যিক রূপ দিয়েছেন। কৃষক জীবনের অনন্ত ক্ষুধার ইতিহাস নির্মাণ করেছেন তিনি।"*

***সূচক শব্দ:*** *উত্তরবঙ্গ, কৃষকজীবন, অনাহার, আউট সাইডার, দলিল, রাষ্ট্র, প্রান্তিক, উন্নয়ন।*

* পিএইচ-ডি গবেষক, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেল- reponroy234@gmail.com

দেবেশ রায় একজন মননঋদ্ধ কথাসাহিত্যিক। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনিতে উঠে এসেছে দ্বন্দ্বমথিত সমাজজীবন বৃত্তান্ত। তিনি অত্যন্ত সচেতনভাবেই বিক্ষুব্ধ সময়কে ধরবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর অসামান্য সৃষ্টি 'মফস্বলি বৃত্তান্ত', 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'সময় অসময়ের বৃত্তান্ত', 'বরিশালের যোগেন মণ্ডল' এবং 'কর্পোরেট'-এর মতো উপন্যাস। আখ্যানের সমগ্র পরিসর মহাকাল ব্যাপ্তিকে ছুঁয়ে যায়। প্রতিটি উপন্যাসই সমাজ জীবনের বাস্তব দলিল। উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্র অনেকবেশি বাস্তবানুগ। উপন্যাসে সৃষ্ট প্রতিটি চরিত্র বহুমুখী পেশায় অন্বিষ্ট। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' লেখকের মাইলফলক উপন্যাস। 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-কে বলা যেতে পারে উত্তরবঙ্গ কৃষকজীবনের দলিল। দেবেশ রায় পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর দশক থেকে শূন্য দশক অবধি বৃহত্তর সময় সন্ধিক্ষণকে ধরেছেন অত্যন্ত মননশীল অধ্যয়নে। সময়-সমাজ জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। সচেতন দৃষ্টিভঙ্গি পড়েছে তাঁর উপন্যাসে। উপন্যাসে জীবন-জীবিকা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে আবর্তিত নয়। বরং সমগ্র ভারতীয় সমাজ-অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক সমীকরণের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি এমন-ই একজন লেখক এবং মননশীল বুদ্ধিজীবী, তাঁর উপন্যাস বিশ্লেষণ করার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞান-প্রজ্ঞা ও বহুমুখী দৃষ্টিভঙ্গি। সময়-সমাজ সম্পর্কে বৃহত্তর অভিজ্ঞান না থাকলে দেবেশ রায়কে চেনা জানা খুবই কঠিন। প্রতিটি উপন্যাস-ই সমাজ-সন্ধিক্ষনের বাস্তবতার ফসল। যার প্রমাণ 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' কিংবা 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' প্রভৃতি উপন্যাস। আখ্যানবিশ্বকে তিনি অত্যন্ত ঋদ্ধ করেছেন। আমার আলোচনার বিষয় দেবেশ রায়ের উপন্যাসে কৃষকজীবন বৃত্তান্ত। সুতরাং কৃষি সম্পর্কিত বৃহত্তর সমস্যা তুলে ধরাই আমার প্রধান অন্বিষ্ট। প্রধানত 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' ও 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' উপন্যাসকে কেন্দ্র করে বিশ্লেষণে আসবো।

দেবেশ রায়ের 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' কৃষক জীবন নিয়ে লেখা অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাস উত্তরবঙ্গের কৃষক-জীবনের দলিল। এই বৃত্তান্তটিতে কোনও বৃত্তাকার কাহিনি নেই, রয়েছে আপাত-বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের সমাবেশ। যেন পাশাপাশি রাখা কয়েকটি ক্যানভাসে নিরাসক্ত অথচ পুঙ্খানুপুঙ্খ তুলির আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই দৃশ্যগুলিতে উপস্থাপন করা হয়েছে একদল প্রান্তিক চাষির জীবন-যাপনের অভিঘাত। দৃশ্যগুলি শুরু হয় উপন্যাসের প্রথম বর্ণনা থেকে। খেতখেতু বা তার ভাইপো চ্যারকেটু বা তার বউ টুলটুলি এবং তাদের সন্তান আট বছরের বৈশাখু, ছ'বছরের বেঙ্গু, চার বছরের খেতেশ্বরী— যারা এ উপন্যাসের চরিত্র। জীবনের আপাত তুচ্ছতাকে উপেক্ষা করে তারা জীবনকে বিপুল ও দিগন্তবিস্তারী করেছে। সূচনাতেই দেখি উপন্যাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র চ্যারকেটুকে প্রসবরত অবস্থায়। যে মাচানে চ্যারকেটু শুয়ে থাকে সেখানে তার শরীরটাও ভালো করে আঁটে না। উপন্যাসে অন্বিষ্ট—

"চ্যারকেটু সই করতে পারে কিন্তু কী সই করে তা জানে না, কোন অক্ষর লেখে তাও জানে না। যুক্তফ্রন্টের সময় বহু ধরে-ধরে এবাদুলের কাছে সই করাটা শিখে নিয়েছে— টিপসই দিতে লজ্জা করে। কিন্তু, দুই হাতের তলায় কাগজটার উপর উবুর হয়ে দুই হাতের তলায় কাগজটাকে চেপে ধরে তার সে-সইটা আঁকতে পারে।"[১]

—চ্যারকেটু সই করতে না পারলেও 'কী অক্ষরে' সই করে তা জানে না। চ্যারকেটু কী কঠোর শ্রমে, ধৈর্য্য ও চাতুরিতে অঞ্চল ও অফিস থেকে গ্রামোন্নয়ন বা ভোটের হিড়িকে চলে আসা বিভিন্ন রঙের পোস্টার সংগ্রহ করে এবং তার জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের বেড়ায় পাটকাঠি বা গাবের আঠায় কীভাবে তাদের কাজে লাগানো যায়, সেই কঠিন সমস্যায় ব্যাপৃত থাকে। উপন্যাসে দেখি—

"এই ঝুরঝুরে ঘরে নানা রঙের নানা রকমের পোস্টার। পরিবার পরিকল্পনা, বসন্তরোগ নির্মূলকরণ, সার, পাম্প, অধিক ফলশীল ধান, জোড়া বলদ, কাঁচি দাও, ধানের শিষ, ইন্দিরা-গান্ধী, হাতুড়ি তারা, গাই-বাছুর। নানা রঙ, নানা ছবি। যে পোস্টার যত পুরনো, তার কাগজের রঙ তত লালচে, ছবির রঙ অস্পষ্ট, লেখাগুলো ধুয়ে-যাওয়া। যে-পোস্টার যত নতুন তার ছবির আর লেখার রঙ তত চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। এই ঘরে সবগুলো পোস্টার যদি একসঙ্গে লাগাতে পারত চ্যারকেটু, তাহলে এত জ্বলজ্বল করত ঘরটা, কেউ বুঝতেই পারতো না। যে বৃষ্টির ছাঁট ঠেকাবার জন্য এত ছবি টাঙানো হয়েছে—সবাই ভাবত ঘরটাকে সাজান হয়েছে। কিন্তু যেমন-যেমন ফাঁক তেমন-তেমন পোস্টার ত আর জোগাড় হয় না। তাই এই ঘরের ভামনি, বেড়া, বাতার মত পোস্টারগুলো ঝুরঝুরে হয়ে যায়। তখন বৃষ্টির ছাঁট বাছুরের গায়ে যাতে না-লাগে সেই উদ্দেশ্যে টাঙানো পোস্টারটা, বাছুরটা

বিক্রি হয়ে যাওয়ার পরও খুলতে গেলে, ঝরঝর করে ঝরে যায়।"[২]

রাষ্ট্র এগিয়ে চলে, পোস্টারগুলো রাষ্ট্রের অগ্রগতির বিজ্ঞাপন হয়। কিন্তু ভূমিহারা, ক্ষুধার্ত মানুষের জীবন আবহমানের মতো অপরিবর্তিত থেকে যায়। উন্নয়নের বিজ্ঞাপনে আড়াল হয় না। এরপর দেখবো চ্যারকেটুর কাকা খেতখেতুকে, তার স্ত্রী টুলটুলি এবং তাদের তিন সন্তানকে— ছয় বছরের বৈশাখু আর একমাত্র কন্যা চার বছরের খেতেশ্বরী। উপবাসী, দুঃখময়, নিরুপায় হয়ে এরা শুধু ভাতের স্বপ্ন দেখে। 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' প্রকৃত প্রস্তাবে এই ক্ষুধারই আখ্যান। যেখানে তিনদিন ধরে অনাহারে থাকা একটি প্রান্তিক কৃষক পরিবারের সদস্য ক্ষুধায় জর্জরিত হয়ে খাদ্যের সন্ধানে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেই সন্ধান–প্রক্রিয়ায় বিচিত্র, বহুস্তরীয় অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। দিনের আলো ফুটলেই ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্যই গোটা পরিবার সচেষ্ট হয়ে ওঠে। আখ্যানকারের কথায়—

"ধানগুলো পেকে এমন টসটসে যে-কোন মুহূর্তে কাটা শুরু হতে পারে। কখনো সখনো এক আধ পেট ভাত খেয়ে না-খেয়ে, ভাতের ফেন জমিয়ে রেখে সারাদিন ধরে, বা মাঠঘাট থেকে কচু তুলে এনে-এনে সিদ্ধ করে খেয়ে, গেলো-বছরের ধানের পুরনো খিদেটাকে সামলে সুমলে এখন নতুন বছরের নতুন ধানকাটার সেই মুহূর্তটি গোনা হচ্ছে।"[৩]

খেতখেতুরা শেষ ভাত খেয়েছে তিনদিন আগে। প্রায় তিনদিন আগে পেটে তাদের ভাতের মাড় পড়েছিল। দেড়দিনেরও বেশি পেটে শুধু জল। চ্যারকেটু, খেতখেতু তার স্ত্রী টুলটুলি, ছয় বছরের বেঙ্গু এবং সর্বোপরি ভাইপো চ্যারকেটু, যে যার আহার্য সন্ধান শুরু করে। চ্যারকেটুকে হাটে গরু বিক্রি করে রাতে ফেরার সময় চাল আনতে পাঠায় খেতখেতু। তিন-চার মাস পর চাষের সময় গরু কোথায় পাবে এই চিন্তায় চ্যারকেটু অস্থির। কিন্তু আগে তো তিন-চার মাস বেঁচে থাকতে হবে! খেতখেতু বাচ্চাদের কান্না ও চিৎকারে ভাষা পায় এই অসহায়তা। টুলটুলি অসহায় মুখ নিয়ে বাচ্চাদের দিকে তাকিয়ে থাকে এবং আলুমিনিয়ামের ভাঙা তোবড়ানো গেলাস যখন বাচ্চাদের মুখে ঢেলে বাসি ফ্যান দেয় তখন সে ছবিতে ক্ষুধার মানচিত্র উঠে আসে। তৃতীয় অধ্যায়ে বৈশাখু আর বেঙ্গু মা'র পিছু পিছু হাঁটতে হাঁটতে পথ হারিয়ে ফেলে। দুই শিশু ধানের খেতের মধ্যেই ভাতের গল্প করে ক্ষুধাকে তাড়াতে চায়। তারপর দেখি—

"বৈশাখু আর বেঙ্গু ধানগাছ সরিয়ে-সরিয়ে, আলো মুছে, ছায়া মুছে এগিয়ে যায়। বৈশাখু দু-একবার মাটি থেকে দু-চারটে ধান খুঁটে মুখে দেয়, তারপর চিবিয়ে ফেলে, ভেতরে দুধও নেই, শুধু তুষ। গাছের গোছাগুলিতে কষ-কষ দুধ হয়তো এসেছে— কিন্তু ধানের ভেতরে দুধ জমে কোথাও চাল হয়নি। এখনো দু-পাঁচ দিন দেরি আছে। তারপর ধানকাটা শুরু হবে। তারপর সেই ধান কাটা হবে। তারপর সেই ধানের চাল হবে। তারপর সেই চালের ভাত হবে। বৈশাখু নাক টানে। বেঙ্গু জিজ্ঞাসা করে, 'কিসের গন্ধ পাছিস?' বৈশাখু জবাব দেয়, 'না পাই। চাউলের গন্ধ পাই কি না-পাই দেখি'।

সামনে একটা গর্ত মতো জমি। সেই জমির কিনারায় বৈশাখু ও বেঙ্গু দাঁড়ায়। ...গর্তের ভেতরের ধানগাছগুলো একটু বেশি লম্বা হয়ে খেতের ওপরের ধানগাছগুলোর প্রায় মাথায়-মাথায় হওয়ায় ওপর থেকে বোঝায় যায় না ওখানে একটা গর্ত আছে। ...সেই গর্তের ভেতরে পাকা ধানগাছে ঢাকা বেঙ্গু কাদাজলে দাঁড়িয়ে বুকের কাছে হাত দুটি জড় করে কেঁদে ফেলেছে—কাউকে শোনানোর কান্না নয়, যাতে কেউ শুনতে না পায় সেইজন্য চাপা কানা পেতের কোন গভীরে গভীরতর ক্ষুধার মতো ভয়ের কান্না। গর্তের ওপরে ধানগাছের গোড়ায় পাকা ধান-খেত ঢাকা বৈশাখু কাঁদে-এত ধান কবে ভাত হবে!"[৪]

একদিকে ধানের শেষ নেই, অন্যদিকে খেতখেতু ও চ্যারকেটুর মতো মানুষদের অনির্দিষ্ট ক্ষুধা ও ক্ষুন্নবৃত্তিরও শেষ নেই। তাই গত তিনদিনের পরিপূর্ণ অনাহার আর আগামী ক'দিনের নিশ্চিত উপবাস পিছনে রেখে নির্দিষ্ট দিনটিতে পরিবারের প্রতিটি সদস্য যে-যার মতো করে সেই ধানে পরিপূর্ণ খেত আলপথের ভিতর দিয়েই খাদ্যের সন্ধান করতে থাকে। যে খাদ্য কচু, ওল, কন্দ, বুনো আলু, মিস্টি আলু, কেশর, বুনো মুলোর মতো কিছু। আখ্যানকারের ভাষায়—

"ধানখেতের আড়ালে-আড়ালে গরুটা নিয়ে চ্যারকেটু চলে গেলে যখন আর তাদের দেখা যায় না তখনও ঐ ধানখেতের দিকে তাকিয়ে থাকতে খেতুর চোখে ভিরমি লাগে। ধানখেত এমন অপরিবর্তিত থেকে যায় যেন গরু আর চ্যারকেটু এই

ধানখেতের ভিতর দিয়ে কোনদিনই যায় নি। প্রচণ্ড ক্রোধে খেতখেতুর মনে হয় 'শালা দিন নাই, অতি (রাত) নাই, অষ্ট প্রহর অষ্ট দিকত এই এক ঝিকিমিকি ধান আর ধান। আগুন দিবার নাগে শালা সারা খেতত, আগুন দিবার নাগে।"[৫]

ঠিক একই রকমভাবে খেতখেতুর বউ টুলটুলিও খাদ্যের সন্ধানে হাঁটে। সে তালমা নদীর পাড়ে কচু বা শিকড় তুলতে যায় বিকল্প খাদ্যের আশায়। কিন্তু এই যে কার্তিকের পাকা ধানের খেতের ভিতর দিয়ে টুলটুলি প্রায় ছোটে সেই পাকা ধানের খেতটাই শেষ হতে চায় না। চারপাশে ধানখেতের উপর উজ্জ্বল টকটকে সূর্যের আলোর প্রতিধ্বনি, এই পাকা ধানে খেতের শুকনো মিষ্টিগন্ধ, পাকা ধানের ওপর দিয়ে কার্তিকের প্রথম উত্তুরে হাওয়ায় শিরশিরানি, এই খেতের পর খেত ধান যে আর শেষ হতে চায় না-এ সবটাই টুলটুলির কাছে অবাস্তব। মাত্র ক'দিনের পর যে খেতের কোণে- কোণে গাছের গোঁড়ায় কাঁচি পড়বে, মাত্র আরও কয়দিন পর যে খেতের সব জায়গাতেই কাঁচি হাঁটে চাষি নেমে পড়বে। মাত্র আর এক মাসের ভিতর মাঠের নির্জনতা, কব্জির দাপটে শিশির ভারি ধানের গোছা নামিয়ে ফেলা আর গাছসুদ্ধ ধান কাটা আর বাতাসে কেটে কেটে ধানের বাঁধা আটি ছেঁড়া আর বেলাডোবা সময় জুড়ে পাখি গাঁই বলদ মেয়ে পুরুষের কলরবে অবাস্তব হয়ে উঠবে। পরিণত শস্যহরিত মৃদু গন্ধময় এই ধান্যময় প্রান্তর টুল-টুলির কাছে এখন অবাস্তব অর্থহীন বিস্তার শুধু। এই ধান ঠেলে টুলটুলি ও তার বেশ কিছু পিছনে বৈশাখু আর বেঙ্গু ও তার দুই ছেলে হেঁটে চলে— বন্যার কুকুর যেমন জল ঠেলে ঠেলে ডাঙার দিকে ছোটে। আসলে আধিয়ার- জোতদারদের ক্ষমতা কমানোর লক্ষ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার থেকে শুরু করে বামফ্রন্ট সরকার ভূমিসংস্কারের কিছু প্রকল্প গ্রহণ করলেও খেতখেতুর মতো পরিবারের কোনও উন্নতি বা প্রগতিই হয়নি। সেইজন্য ধানের খেত দেখে টুল-টুলির খিদে পায়, আর বৈশাখু স্তব্ধ হয়। তারা স্বপ্ন দেখে দু'মুঠো ভাতের এবং মনে মনে বিদ্রোহ পুষে রাখে। ধানখেতকে কিছুতেই তারা আড়াল করতে পারে না। এক অপরিবর্তিত অনড় দৃশ্য হয়ে সে প্রেক্ষাপটে থেকে যায়। ক্ষুধার্ত মানুষগুলোর ভয়াবহ ক্ষুধাও অপরিবর্তিত থেকে যায়, তাদের মধ্যে কোনও সম্পর্ক তৈরি হয় না। যে যার নিজের বিচ্ছিন্নতা নিয়ে সমান্তরালভাবে থেকে যায়, কোন মানবিক বিনিময় ঘটে না। ধান খেতকে এড়াতে পারেনা বৈশাখু ও বেঙ্গুও। বৈশাখু ও বেঙ্গু ওপর দিকে তাকায়। এখানে ধানখেতের ভিতর থেকে ওপর চিকে তাকালে মনে হয় আকাশেই ধান পোঁতা আছে। ওরা ধানগাছের তোলা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে। বৈশাখু নাক টেনে চালের গন্ধ পেতে চায়। ধানের দিকে তাকিয়ে বলে—

"এত ধান আর ভাত পাম না কেনে রে। বেঙ্গু জানতে চায়, ধানখেতত ভাত নাই? তারপর আর্তনাদ করে ওঠে, জাগিলে বড় ভোক।... দাদা হামার বড় ভোক। হামাক মারি ফেলা। মুই আর বেঙ্গু থাকিম না। মুই যখহম।"[৬]

বেঙ্গু ও বৈশাখু যেন শুধু নিজেদের পেটের খিদের কথা জানে কিন্তু বুঝে উঠতে পারেনা তাদের এই পরিণতির জন্য দায়ী কে বা কারা।

আসলে খেতখেতুর পরিবার ও সেই পরিবারের মূল খুঁটি চ্যারকেটুকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে 'মফস্বলি বৃত্তান্ত'-র আখ্যান। রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের কোন অর্থ এই পরিবার বহন করে না। আখ্যানকারের ভাষায় দারিদ্র্যের কোন গৌরব নেই, বড় বেশি অপমান। সে-জন্যই 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' পেয়েছে ক্ষুধার মানচিত্র। আর এই ক্ষুধায় হয়ে ওঠে ভারতবর্ষের সেইসব মানুষের আত্মপরিচয়ের লিপি, যারা ভারতবর্ষের মানচিত্রের ভিতর বসবাস করলেও তাঁরা প্রকৃতপক্ষে অপরিচিত থেকে যায়। কোনোরকম রাষ্ট্রীয় পরিচয় দিয়ে তাদের চিহ্নিত করা যায় না। ক্ষুধার শর্তেই তারা বেঁচে থাকে, ক্ষুধাই তাদের একমাত্র চিহ্নক। সেজন্য ধানখেতের দিকে তাকিয়ে খেতখেতুকে ভাবতে হয়—

"খেতখেতু একবার এই জমিগুলির দিকে তাকায়। সব জমিই ধানখেত। ধানে-ধানে এক জমির সঙ্গে আর—এক জমির কোন পার্থক্য নেই। এর ভেতর কোন জমি দহলা (নিচু), কোন জমি পালান (খুব নিচু), কোন জমি ভাঙা, কোন জমি পড়া (পতিত), কোন জমি সারুক (উর্বর), কোন জমি পাথারি, কোন জমি বালু। কোথাও তিনচাষেই জমি তৈরি হয়েছে, কোথাও হয়ত পাঁচ চাষ পর্যন্ত লেগেছে— যদি কেউ অত খরচ করে থাকে। এর ভেতর আবার আছে পদ্মা, আই-আর-এইসব বিছন। এগুলো খেতখেতু ত প্রায় না দেখেই বলতে পারে—

কিন্তু মাসান, মুই ক্যানং করি কহিবার পার, কুন জমি কার নামে রেজিস্টারি হইছে কি হয় নাই, কুন জমি কার নামে পাট্টা হইছে কি হই নাই, কুন জমি ঠিকায় চলিবার ধরিছে আর কোন জমি বেনামা চলিছে। মোর কোন খতিয়ান নাই। মুই ক্যানং করি কম, কুন জমি কোন জোতদারের নিজ খতিয়ানে আর কুন জমি কুন জোতদারের খাশ খতিয়ানে। জমির মালিকানা এলায় নদীর জলের নাখান-হেই চড়া পড়িবার ধরিছে আবার হেই ভাসি যাছে। মুই ক্যানং করি জানিম। সগায় বদলাবার ধরিছে। পদ্মনাথ আছিল জোতদার-হইছে নিজচাষি। অমনীকান্ত আছিল পঞ্চায়েত-হইছে মেম্বার। নরেন সরকার আছিল জোতদার-হইছে এফ-সি-আই-এর এজেন্ট। তামান বদলাই গিছে। কিন্তু মুই খেতখেতু থাকি গিছু, মুই বদলাও নাই।" [৭]

অর্থাৎ আধিয়ার বারবার বদলালেও খেতখেতুর অর্থনৈতিক অবস্থা বদলাই নি। খেতখেতুকে শুধুমাত্র ফসল উৎপাদন কাজে লাগিয়েছে। পুরুষানুক্রমে পাকা ধানের মধ্যে থেকেও সর্বহারা খেতখেতু দাঁড়িয়ে থাকে নির্বিকার হয়ে। পেটে প্রায় তিনদিন আগে ভাতের মাড় পড়েছিল, দেড়দিনেরও বেশি পেটে শুধুই জল নিয়ে চ্যারকেটুও দাঁড়িয়ে থাকে 'প্রান্তিক ক্ষুধা' নিয়ে।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে তিস্তাসংলগ্ন অঞ্চলের উন্নয়নে সেখানকার প্রান্তিক কৃষক চাষি কীভাবে অপাংক্তেয় থেকে গেছে তার-ই আখ্যান 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'। এই উপন্যাস জুড়ে রয়েছে বাঘারু, কাদাখোয়া, মাদারি, মাদারির মায়ের মতো ভারতবর্ষের দরিদ্র কিছু মানুষ। যে উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে এইসব অক্ষরজ্ঞানবর্জিত, সমাজহীন, রাষ্ট্রহীন মানুষদের জীবনকাহিনী। 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' ছয়টি পর্ব ও পরিশিষ্টে বিন্যস্ত লেখকের মহাকব্যিক আখ্যানবৃত্ত। প্রথম পর্ব: 'আদিপর্ব-গয়ানাথের জোতজমি', 'দ্বিতীয়পর্ব: বনপর্ব-বাঘারুর নির্বাসন', 'তৃতীয়পর্ব: চরপর্ব-নিতাইদের বাস্তুত্যাগ এবং সীমান্তবাহিনীর সীমান্তত্যাগ', 'চতুর্থপর্ব: বৃক্ষপর্ব-বাঘারুর প্রত্যাবর্তন', 'পঞ্চমপর্ব: মিছিলপর্ব-উত্তরখণ্ডের স্বতন্ত্র রাজ্য দাবি', 'ষষ্ঠপর্ব: অন্ত্যপর্ব-মাদারির মায়ের স্বতন্ত্র রাষ্ট্র' এবং 'পরিশিষ্ট-দুই উনিশ এই বৃত্তান্ত রচনার যুক্তি ও বৃত্তান্ত সমাপ্তির কারণ'। কী আছে আখ্যান পরিসরে। প্রথমেই অন্বিষ্ট—

"১৯৭০-এর দশকেরই কোন একটি সময় উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ির জিলার ডুয়ার্সের তিস্তা-সন্নিহিত অঞ্চলে সেটেলমেন্টর জরিপের কাজ চলছিল। ডুয়ার্সের জমি-বড় বড় জোতে, ফরেস্টে ডিপার্টমেন্টের অধীনে ফরেস্টে, চা-বাগানে, হাজার রকম জটিলতার গিঁটে জড়ানো। গয়ানাথ জোতদার তেমনই এক জমির মালিক, 'গিরি'। সে ডুয়ার্সের এসব জমিই তার দখলে রাখে ও রাখতে চায়। নদির তলার মাটি ও বন্যায় উপড়ানো শালগাছও। প্রায় সমতুল্য লোভী ও বেআইনি দখলদা এখানকার চা- বাগানগুলিও।

এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বসবাস প্রধানত রাজবংশী জনগোষ্ঠীর মানুষজনের ও সাঁওতাল-কোল-মুণ্ডাদের, যাঁদের স্থানীয় নাম মদেশিয়া। তিস্তার চরে পূর্ববঙ্গের কৃষকরা বসতি গেড়ে এখানকার কৃষিকাজের আমুল বদল ঘটিয়েছেন।

নানারকম স্বার্থ নিয়ে নানা জনগোষ্ঠীর বিরোধ ও সংস্কৃতিতেও ধরা পড়ে যায়। রাজ্য সরকার তিস্তায় ব্যারেজ তৈরি করে প্রচলিত উন্নয়নের আওতায় নিয়ে আসে এই অঞ্চলকে।

এই বিচিত্র বিপুল, বিস্তারিত জনজীবনের এত সব বদলের ভিতর থেকে তৈরি হয়ে ওঠে বাঘারু নামে এক মানুষ। যে এখানকার আদি মানুষদের একজন। তার বাপ কে সে তা জানে না। তার মা তাকে প্রসব করেছিল গভীর ফরেস্টে। তাকে বেঁচে থাকার জন্য বাঘের সঙ্গে হাতাহাতি লড়তে হয়েছিল। এখন তার পরিচয় সে গয়ানাথের জোতদারের মানসি, বাঘারু।

শেষ পর্যন্ত এই পরিচয়হীন বাঘারুর, তার জন্মেরও আগের পরিচয় নিয়ে এই উন্নয়ন সমাজ, চা-বাগান, জোতজমি ছেড়ে চলে যায়—মাদারির নামে এক বালককে সঙ্গে নিয়ে।" [৮]

'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-র আখ্যানের অন্দরে প্রবেশ করা যাক—আখ্যান শুরু হয়েছে অগণন মানুষের হাঁটা আর প্রায় মিছিল দিয়ে। সব হাঁটারই গন্তব্যস্থল কিন্তু ক্রান্তিরহাট। উত্তরবঙ্গের আপলচাঁদ ফরেস্টের কাছাকছি অতি নির্দিষ্ট এই স্থান। সেটেলমেন্ট অফিসের অধস্তন কর্মী প্রিয়নাথ, যার পিঠে ঝোলান সাইনবোর্ড হলকা ক্যাম্প। প্রিয়নাথের সুবাদে পরিচিত হই সেটেলমেন্ট অফিসের তরুণ অফিসার সুহাসের সঙ্গে—যে জরিপ করতে এসেছে এখানকার জমি এবং পরবর্তী ঘটনাবলীর প্রধান কেন্দ্র।

তারপর ক্রমশ সামনে হাজির হয় কৃষক-সমিতির নেতারা, এম.এল.এ. বীরেন্দ্রনাথ রায় বর্মণ এবং সবচেয়ে ঘোরালো ব্যক্তি গয়ানাথ জোতদার। যথারীতি হাটের গলামাল আছেই, আক্ষরিক অর্থে তার ওপর জরিপ নিয়ে লিডারদের বক্তৃতা, কৃষক মজুর সংঘর্ষ, জোতদার গয়ানাথের ছদ্ম-সারল্য ও স্বার্থসন্ধান, এম.এল.এ-র ব্যক্তিত্বময় হস্তক্ষেপে এবং সবকিছুর দ্রষ্টা একদা 'নকশালবাড়ি ঘর আর এখন সেটেলমেন্ট অফিসার সুহাস। 'আদিপর্ব : গয়ানাথের জোতজমি' আখ্যানবৃত্তে আকস্মিক উঠে আসে নায়ক বাঘারু, দেউনিয়া গয়ানাথের মানসি বাঘারু।

প্রথম আবির্ভাবেই বাঘারুর আত্মপরিচয়ের সংকট নয়, অসম্ভবতায় বারবার ঘুরে ফিরে আসে—

"কামতই তো নামখান হয়। মোর তো সেইটাই গোলমাল। হাজারিয়া কাম। হাজারিয়া নাম। কামও বদলি যাছে, নামখানও বাড়ি যাছে। এক কামের পরে অনেক কাম, এক নামের পর আরেক নাম।... মানষিলা তো মোক বাঘারু নামখান দিয়াই খালাশ, কন্তু মুই লগাম কুনঠে? মানষিলা তজানে না, মোর আর-একখান নাম আছিল। গয়ানাথের দিছে।... গয়ানাথ মোর মাও এর দেউনিয়া, মোর দেউনিয়া, জমির দেউনিয়া, ফরেস্টের দেউনিয়া, তিস্তা নদীর দেউনিয়া, ভোটের দেউনিয়া।... মুই মোর নামখান বদলি ফরেস্টার করি নিছু, মোর পাকা নাম—। লিখা আছে ফরেস্টচন্দ্র বর্মণ। কিন্তু মই কহি ফরেস্টারচন্দ্র বর্মণ।"[৯]

আবার বাঘারুর নাম হতে পা

রে 'কুড়ানিয়ার ছোঁয়া'—কারণ ফরেস্টের ভেতরে শুকনো কাঠ আর ডালপালা কুড়িয়ে নিয়ে পেট চালাত যে মাতালই পেটে তার জন্ম। মা নিজের হাতে কুড়ল দিয়ে নাড়ী কেটে তার জন্মকে সম্পূর্ণ করে, তাই তার নাম হতে পারে 'কুড়ালিয়া কোটা'। হতে পারে ফরেস্টুয়া, কারণ এই ফরেস্টেই তার জন্ম ও লালন। তার পশ্চাদ্দেশে চিহ্ন রয়ে গেছে বাঘের থাবার, বাঘের সঙ্গে লড়াই করে তার বেঁচে থাকা, তার নাম অবশ্যই হতে পারে বাঘারু। বাঘারু বোঝে অন্যদের মতো এই নাম সত্যিকারের নয়, তাই এম.এল.এ.র কাছে অন্যদের মতো সেও একটা নাম চায়। কিন্তু এই নাম নিয়ে পরে দেখা অনন্ত সমস্যা। অরুণ সেন বাঘারুর জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন—

"বাঘারুর এই জন্মান্তর কি আসলে লেখকেরই মন ও কল্পনার সক্রিয়তা? নিষ্ঠুর জন্মসূত্রে, অন্যায় পরিপার্শ্বে, সমাজ ও অর্থনীতির কঠিন শোষণে বাঘারু যা হয়েছে এবং যা হতে পারেনি, তার ব্যবধান কি ঘুচে যায় সেই পরিকল্পনায়? বাঘারুর বাস্তব কি স্পর্শ করে এভাবে লেখকের বাস্তবকেই? এইভাবেই অতিক্রম করে যায় নিচুতলার বাস্তবকে?"[১০]

—প্রকৃতিতে যেমন অপার রহস্য, তেমনি তার সামনে একাত্মতায় বাঘারুর নগ্ন শরীরে সাড়াগুলিও রহস্যময় হয়ে ওঠে। তার শরীরের ভাষায় তো তার মুখের ভাষা। প্রকৃতির রহস্যকে ছাপিয়ে যাচ্ছে বাঘারুর অস্তিত্বে, বাঘারুর বাচনেই ওই রহস্য।

নির্বাসন থেকেই বাঘারুর প্রত্যাবর্তন ঘটে। তাকে পাই 'বৃক্ষপর্ব-বাঘারুর প্রত্যাবর্তন'-এ শনিবার রাত তিনটের সময় আপলচাঁদের ভিতরে তিস্তার পারে। যেখানে দাঁড়িয়েছিল গয়ানাথ ও তার জামাই আসিন্দির এবং তাদের একটু পেছনে বাঘারু। তারা তিস্তার ফ্লাড দেখছিল। তিস্তার ভয়াবহ বন্যায় বাঁধ ভেঙে জল ঢুকে পড়েছে গজালডোবায়—

"আপলচাঁদ ফরেস্টের ভেতরে গাজলডোবা যেখানে, সেখানে, শনিবার বেকেল থেকেই তিস্তা পাড় ভাঙছিল। ভাঙতে ভাঙতে রাত বারোটা নাগাদ সেখানে একটা ছোট সোঁতমতোই যেন হয়ে যায়। এমন সোঁতা নয় যে তিস্তার জল ওখান দিয়ে হু হু করে ঢুকে আপলচাঁদের ভেতর দিয়ে ছুটবে। কিন্তু এমন একটা সোঁতা যে তিস্তার ফ্লাডের জল এখন ওখানে এসে ধাক্কা মারবে ও আরো মাটি খাবে। পরে, তিস্তার ফ্লড যখন সরে যাবে—

এ সোঁতাটাও শুকিয়ে যাবে।"[১১]

—এরপর ঘটে যায় বাঘারুর অমোঘ উচ্চারণ। সমস্ত শক্তি নস্যাৎ করে দিয়ে বাঘারু অন্ধকারাচ্ছন্ন জলস্রোতে বৃক্ষবাহন করে। অনুপুঙ্খ ডিটেলস পেয়ে যায় 'বাঘারুর প্রত্যাখ্যান' পর্বে।

গ্রহণ আর প্রত্যাখ্যান কী, বাস্তবে বাঘারুর তো বোঝার কথা নয়! লেখক নতুন করে স্বপ্ন দেখান তিস্তা নদী আর আপলচাঁদ ফরেস্টের বাইরে বাঘারু আর মাদারি মায়ের চোখে। প্রত্যখ্যানের মধ্যে দিয়েই আলোর নিশানা জ্বালিয়ে দেন।

"আবারও কি বৃত্তান্তকারেরই কণ্ঠস্বর শুনি? যে 'উন্নয়ন' বাঘারুর, মাদারির মায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎকে স্পর্শ করেনা, যে 'উন্নয়নে' তাদের প্রবেশাধিকার নেই, ভূমিকা নেই, যে 'উন্নয়ন' তাদের প্রত্যাখ্যান করে-তাকে কি লেখকও প্রত্যাখ্যান করতে উদ্যত? বাঘারুর প্রত্যাখ্যান কি তারই রূপক?"[১২]

—আখ্যানের শুরু যেমন সমবেত মানুষের হাঁটা দিয়ে সমাপ্তিও লেখক করলেন শুধু বাঘারু আর মাদারির হাঁটার অনুসঙ্গ নিয়ে।

"বাঘারু তিস্তাপার ও আপলচাঁদ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। মাদারিও তার সঙ্গে যাচ্ছে। যে কারণে তিস্তাপার বা আপলচাঁদের শালবন উৎপাটিত হবে-সেই কারণে বাঘারু উৎপাটিত হবে।... বাঘারু এই ব্যারেজকে, এই অর্থনীতি ও উন্নয়নকে প্রত্যাখ্যান করল। বাঘারু কিছু কিছু কথা বলতে পারে বটে কিন্তু প্রত্যাখ্যানের ভাষা তার জানা নেই। তার একটা শরীর আছে। সেই শরীর দিয়ে সে প্রত্যাখ্যান করল।...

এই প্রয়াখ্যানের রাত ধরে বাঘারু মাদারিকে নিয়ে হাঁটুক, হাঁটুক, হাঁটুক..."[১৩]

অন্তহীন হাঁটা, আবার নতুন বৃত্তান্তের শুরু!

দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' তিস্তা নামক নদীর সঙ্গে এই সমস্ত সংলগ্ন মানুষের সহবাসের রীতিনীতির বৃত্তান্ত। তিস্তার সঙ্গে সকলের সহবাসের রীতিনীতি কিন্তু এক নয়। জোতদার গয়ানাথের সাথে তিস্তার সহবাস একরকম, বাস্তুহারা নিতাইদের সঙ্গে আর একরকম আর সীমান্তবাহিনীর সঙ্গে আর একরকম। তিস্তাপারের প্রাগৈতিহাসিক, দুর্মর রহস্য ঘেরা, নিরাবরণ-নিরাভরণ বাঘারু তার মানবস্বভাবে প্রাকৃতিক— সে কেবল মানুষ, একজন মানুষ ছাড়া কিছু নয়। আখ্যানের সব কিছু বদলায়, কিন্তু বদলায়নি শুধু দুটি মানুষ; বৃন্তচ্যুত-বন্ধন শিথিল থেকে যায়— বাঘারু ও মাদারি। বাঘারু ও মাদারি তিস্তার ইতিহাসে— ভূগোলে 'আউট সাইডার'। দেবেশের বৃত্তান্তে নদী, ব্যারেজ অর্থনীতি, উৎপাদন— সবকিছুর বদল আছে। কিন্তু বাঘারুর কোনও অর্থনীতি নেই, উৎপাদন নেই। উপন্যাস যেখানে শেষ হচ্ছে সেখানে তিস্তার নদী অরণ্য বদলে গিয়ে এক নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার জন্ম নিচ্ছে আর এই অভিনব উৎপাদন ব্যবস্থায় বাঘারু, মাদারির মা, মাদারি তাল রাখতে পারে না।

**তথ্যসূত্র :**

১। দেবেশ রায়, 'মফস্বলি বৃত্তান্ত' কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৮০, পৃ. ১৭
২। তদেব, পৃ. ২১
৩। তদেব, পৃ. ৩১
৪। তদেব, পৃ. ৪২
৫। তদেব, পৃ. ৮৩
৬। তদেব, পৃ. ৫২
৭। তদেব, পৃ. ১২৭
৮। দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত— ব্লার্ব', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, ষোড়শ সং জুলাই ২০১১
৯। দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' 'আদিপর্ব গয়ানাথের জোতজমি', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, ষোড়শ সং ২০১১, পৃ. ১০৯
১০। অরুণ সেন , 'দেবেশ রায় বৃত্তান্ত', 'দেবেশ রায় সম্মননা সংখ্যা', চতুর্দশ সংখ্যা, 'কঙ্ক', আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৬৩
১১। দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত' 'বৃক্ষপর্ব বাঘারুর প্রত্যাবর্তন', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ জুলাই ১৯৮৮, ষোড়শ সং জুলাই ২০১০, পৃ. ৩১৭
১২। অরুণ সেন, 'দেবেশ রায় বৃত্তান্ত', 'দেবেশ রায় সম্মননা সংখ্যা', চতুর্দশ সংখ্যা, 'কঙ্ক', আগস্ট ২০১৪, পৃ. ১৭০
১৩। দেবেশ রায়, 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত', 'পরিশিষ্ট', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৮, ষোড়শ সং জুলাই ২০১০, পৃ. ৫৯২